بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১৩ মার্চ, ২০১৫ মোতাবেক ১৩ আমান, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর কল্যাণে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সামনে আসে **যার মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট নির্ধারণে আজও আমরা পথ-নির্দেশনা পাই**।

প্রথম ঘটনা বা রেওয়ায়েত তবলীগের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগ আর এ ক্ষেত্রে তিনি জামা'তকে কেমন দেখতে চেয়েছেন— সে সম্পর্কে। ইসলামের তবলীগের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে উদ্দীপনা ও বেদনা ছিল এবং জামা'তের সদস্যদের মাঝেও তিনি যার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন- সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে তবলীগের প্রেক্ষাপটে অভিনব সব চিন্তাধারার উদয় হতো এবং দিবা-রাত্র তিনি এ চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন যে, যেকোন মূল্যে এই বাণী যেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়। একবার তিনি প্রস্তাব করেন যে, আমাদের জামা'তের পোশাক স্বতন্ত্র হলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই এক জীবন্ত তবলীগ হতে পারে। ...এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব সামনে আসে। **(আল্ ফযল, ১০ম খণ্ড, সংখ্যা-১, পৃঃ ১৬)**

অর্থাৎ যেন চেনা যায় যে, এ ব্যক্তি আহমদী। নিছক স্বতন্ত্র পরিচিতির কোন অর্থ হয় না। নিশ্চয় তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, একদিকে সবার একই রকমের পোশাক দেখে এবং কর্ম ও বিশ্বাসগত অভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে অ-আহমদীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অপরদিকে নিজের মাঝেও এ চেতনাবোধ জাগ্রত হবে যে, আমি একজন আহমদী হিসেবে পরিচিত হব, তাই আমাকে আমার কর্ম এবং বিশ্বাসগত অবস্থা সঠিক রাখতে হবে।

অতএব আজও আমাদের মাঝে এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বাহ্যিক পোশাকের কোন মূল্য নেই, কিন্তু কমপক্ষে আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন আমাদেরকে দেখে মানুষ চিনতে পারে যে, এ ব্যক্তি আহমদী এবং অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র।

পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্নতা ও সরলতা

পোশাকের কথা হচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একজন মুবাল্লেগ বা ধর্মের সেবকের চেহারা কেমন হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তবলীগের জন্য **মুবাল্লিগের চেহারা মু'মিন সুলভ** হওয়া আবশ্যক। খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, **তাই আমি খোদ্দামুল আহমদীয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছি, তাদের বাহ্যিক চেহারা-সুরত যেন**

ইসলামি শিক্ষা সম্মত হয়। আর তাদের দাড়ি, চুল ও পোষাকে অনাড়ম্বরতা থাকা চাই। ইসলাম তোমাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানে বারণ করে না। (পোশাক অবশ্যই পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, এটি ইসলাম নিষেধ করে না) বরং ইসলাম নিজেই নির্দেশ দেয় যে, তোমরা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতন থাকবে এবং নোংরামীর ধারে কাছেও যাবে না। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কৃত্রিমতা অবলম্বন করা নিষেধ। (অনেকের অভ্যাস থাকে কিছুক্ষণ পর পর নিজের পোশাকের দিকে তাকায়।) কিছুক্ষণ পরে পরেই কোটের কলার দেখতে আরম্ভ করে যে, কোথাও ধূলা পড়ে নি তো! এটি একটি বাজে অভ্যাস। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অনেকেই অনেক উন্নত মানের পোশাক নিয়ে আসতো আর তিনি তা পরিধানও করতেন, কিন্তু পোশাকের প্রতি কখনো এত বেশি মনোযোগ দিতেন না যে, সব সময় পোশাক ব্রাশ করাবেন আর মনে এই চিন্তা থাকবে যে, কোথাও এতে ধূলা পড়ে নি তো! (তিনি বলেন, কাপড়ে) ব্রাশ করানো নিষেধ নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে অতি বাড়াবাড়ি করা বা সময়ের বেশিরভাগ এ সব কাজে নষ্ট করা কোন ভাবেই পছন্দনীয় বলে গণ্য হতে পারে না। ...(তিনি বলেন) অনেকে পোশাকের ব্যাপারে এতটা হীনমন্যতার শিকার হয় যে, আমি দেখেছি দাওয়াতের সময় অনেকের চেহারা কাঁদোকাঁদো হয়ে যায় যে, আমাদের কাছে অমুক ধরনের কোট নেই বা অমুক ধরনের পোশাক নেই। মানুষের নিজের পোশাক যেমনই থাকুক না কেন, সেই পোশাক পরিধান করেই আত্মবিশ্বাসের সাথে তার অন্যদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া উচিত। আসল বিষয় হল নগ্নতা ঢাকা, পরিপাটি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন থাকা। নগ্নতা ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত পোশাক থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে শুধু এ কারণে বঞ্চিত থাকে যে, আমার কাছে অমুক ধরনের কোট নেই বা অমুক শার্ট নেই, তাহলে এটি ধর্ম নয় বরং এটি বস্তুবাদিতা। **(খোদ্দামুল আহমদীয়া সে খেতাব, আনোয়ারুল উলুম, ১৬তম খণ্ড, পৃ: ৪৪১-৪৪২)**

অতএব জীবন উৎসর্গকারীদের, বিশেষত মুবাল্লিগদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে জামা'তের সাধারণ সদস্যদের জন্যেও এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। বাহ্যিক সাজ-সজ্জার প্রতি এতো মনোযোগী হবেন না যে, আসল উদ্দেশ্যই উপেক্ষিত হবে। আবার অনেকে এমনও আছে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মোটেই যত্নবান নয়। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই সব বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। একপেশে হওয়া উচিত নয়।

তবলীগের প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তবলীগের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা উচিত। একবার তিনি দিল্লী যান এবং বলেন যে, এবার দিল্লীতে আমার এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিল্লীবাসীরা এখন কুটতর্ক করা ছেড়ে দিয়েছে। নতুবা পূর্বে যখনই এখানে আসার সুযোগ হয়েছে দিল্লীর সকল শ্রেণীর মানুষ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো আর অদ্ভুত সব বিতর্ক আরম্ভ করে দিত, আর কেউ কোনদিন কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলে নি। তিনি বলেন, আমার মনে আছে তখন আমি ছোট ছিলাম। একবার আমি এখানে আসি এবং এক আত্মীয়ের ঘরে অবস্থান করছিলাম। তখন হায়দ্রাবাদের এক আত্মীয় সম্পর্কের ভাই নানির সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন যার কাছে হযরত আম্মাজান অবস্থান করছিলেন। তিনি (অর্থাৎ

আত্মীয় সম্পর্কের সেই ভাই) আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, এই ছেলে কে? আমার নানি হযরত আম্মাজানের নাম নিয়ে বলেন যে, অমুকের ছেলে। হযরত আম্মাজানের নাম শুনে তিনি আমাকে বলেন যে, তোমার পিতা এ কী হট্টগোল সৃষ্টি করে রেখেছে? মানুষ বলে তোমার পিতা নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে অদ্ভুত সব কথা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তখন আমার বয়স যদিও কম ছিল কিন্তু ভয় পাওয়ার পরিবর্তে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত যুক্তি যেহেতু আমার খুব ভালোভাবে জানা ছিল তাই আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলা আরম্ভ করি। আমি বলি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু একথা বলেন যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন আর এ যুগে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দীর আসার কথা, তিনি এই উম্মত থেকেই আসবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কুরআনের সেই সব আয়াত যা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়, তা থেকে يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (সূরা আলে ইমরান: ৫৬) আয়াতটি আমার মুখস্থ ছিল, তাই আমি এই আয়াত সংক্রান্ত পুরো বিষয় খোলাসা করে বর্ণনা করি। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন যে, সত্যিই এই আয়াত থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাহলে এই সমস্ত মৌলভীরা হৈ চৈ করে কেন? তখন আমি বললাম যে, একথা আপনি মৌলভীদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু এতে নানির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল দেখুন। তিনি (রা.) বলেন, আমার নানী চিৎকার আরম্ভ করে যে, তওবা কর, তওবা কর। এই বাচ্চার মাথা পূর্বেই এসব কথা শুনে বিকারগ্রস্থ আর তুমি তার সত্যায়ন করে এই কুফরিতে তাকে আরো পোক্ত করে দিচ্ছো। **(হামারে যিম্মাহ তামাম দুনিয়া কো ফাতাহ্ করনে কা কাম হ্যায়, আনোয়ারুল উলুম, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩-৪৫৪)**

তবলীগ করার পন্থা

এরপর তবলীগের প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর তবলীগের রীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, **মিয়াঁ শের মুহাম্মদ সাহেব একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন**। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ধর্মের জন্যে নিবেদিত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং টমটম গাড়ী চালাতেন। খুব সম্ভব ফলো (যা একটি জায়গার নাম) থেকে যাত্রী নিয়ে বাঙ্গা যেতেন। তার রীতি ছিল, কোন যাত্রীকে টমটম গাড়ীতে বসাতেন আর চলন্ত টমটমে যাত্রীর সাথে গল্প করা আরম্ভ করতেন। 'আল-হাকাম' পত্রিকা সাথে রাখতেন। পকেট থেকে পত্রিকা বের করে যাত্রীদের জিজ্ঞেস করতেন যে, আপনাদের মাঝে কেউ পড়ালেখা জানে কি? কোন পড়ালেখা জানা ব্যক্তি থাকলে তাকে বলতেন যে, আমার নামে এই পত্রিকা এসেছে, আমাকে এই পত্রিকাটি একটু পড়ে শুনান। টমটম গাড়ীর যাত্রীদের যেহেতু ঝাঁকি লাগে তাই যাত্রীরা কোন কিছুতে ব্যস্ত থাকতে চাইতো। তাই তারা সানন্দে পত্রিকা পড়া আরম্ভ করে দিত।

পত্রিকা পাঠ করা আরম্ভ হলেই তিনি (অর্থাৎ মিয়া শের মুহাম্মদ সাহেব) প্রশ্ন করা আরম্ভ করতেন যে, এটি আবার কী লেখা হল, এই কথার অর্থ কী? মিয়া শের মুহাম্মদ সাহেব এমনই করতেন আর এমনভাবে প্রশ্ন করতেন যে, অ-আহমদী পাঠককে চিন্তা করে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো

আর এভাবে সেই কথাটি ভালোভাবে তার হৃদয়ঙ্গম হয়ে যেত। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] এই ঘটনা যখন তিনি আমাকে শুনিয়েছেন তখন পর্যন্ত তার মাধ্যমে ডজনের অধিক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। আর এটি শুধু আল-ফযল বা আল-হাকাম পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে। এরপরও দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। জানিনা এভাবে আরো কতজন মানুষ তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করে থাকবে। এককথায় কাজ আরম্ভ করতে বড় বড় আলেম পাওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক নয়, বরং কোন শিক্ষিত মানুষ পাওয়া যায় না, এমন অঞ্চলসমূহে অশিক্ষিত আহমদী যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকেই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক, তাদেরকে মৌখিকভাবেই কথা বুঝানো যেতে পারে। অনেক ছোট ছোট জামা'ত রয়েছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহের জামা'ত রয়েছে, তাদের জন্য এই নির্দেশ বিশেষভাবে দেয়া হচ্ছে, যেন এ কাজ আরম্ভ হতে পারে। যদি আমরা আলেমদের অপেক্ষায় বসে থাকি তাহলে জানা নেই যে, তাদের অপেক্ষায় কত দিন কেটে যাবে?

(এখনও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যদিও বিভিন্ন দেশের জামেয়ায় মুরব্বীদের একটি বিরাট সংখ্যা পড়ালেখা করে বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাসত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতের চাহিদাও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।) আলেমদের যেহেতু ধর্মের সূক্ষ্মতায় প্রবেশ করতে হয় তাই তাদের জ্ঞান অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ধর্মে অনেক সূক্ষ্ম দিক রয়েছে এবং তা শিখার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, এই বাস্তবতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বলেছেন, "আদ্‌দীনু ইউসরুন" অর্থাৎ সহজ-সাধ্যতার নামই হল ধর্ম। **(আল-ফযল কাদিয়ান, ৭ নভেম্বর ১৯৪৫, পৃ: ৩, ৩৩তম খণ্ড, সংখ্যা ২৬১)**

তাই তবলীগের জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক বা বড় বড় সব সেমিনার এবং অনুষ্ঠানের উপরই নির্ভর করতে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ যুগেও এমন অনেক আহমদী আছেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে তবলীগের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করেন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা অনেক সফল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব উভয়েরই এক বন্ধুর একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। **এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর যুগের একটি মজার ঘটনা। তাঁর (আ.) এক বন্ধু ছিলেন** যিনি মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীরও বন্ধু ছিলেন। সেই ব্যক্তির নাম ছিল নিযামুদ্দীন। তিনি সাতবার হজ্জ্ব করেছিলেন। অত্যন্ত হাস্যোৎফুল্ল থাকতেন। যেহেতু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী উভয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেন আর মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাঁর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া দেয় তখন তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাধুতায় তার অগাধ আস্থা ছিল। তিনি লুধিয়ানায় থাকতেন। বিরোধীরা যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কিছু বলতো তিনি তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেন। তিনি বলতেন, তোমরা প্রথমে গিয়ে মির্যা সাহেবের অবস্থা যাচাই করে দেখ। তিনি অনেক পুণ্যবান মানুষ। আমি তাঁর কাছে অবস্থান করে দেখেছি, যদি তাকে [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] কুরআন থেকে কিছু বুঝিয়ে দেয়া হয় তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি

আদৌ প্রতারণা করেন না। যদি কুরআন থেকে তাকে বুঝিয়ে দেয়া যায় যে, তাঁর দাবি ভ্রান্ত তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা মেনে নেবেন।

তিনি অনেক সময় মানুষের সাথে এটি নিয়ে ঝগড়া করতেন এবং বলতেন যে, আমি যখন কাদিয়ানে যাব তখন আমি দেখব যে, তিনি কিভাবে তাঁর দাবি প্রত্যাহার না করেন। (তিনি বলেন যে,) আমি কুরআন খুলে তাঁর সামনে রাখব [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে] আর যখন ঈসা (আ.)-এর জীবিত আকাশে যাওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত তার সামনে উপস্থাপন করব তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা গ্রহণ করবেন। আমি ভালোভাবে জানি যে, তিনি কুরআনের কথা শুনে কোন কূটকথা বলেন না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একদিন তিনি লুধিয়ানা থেকে কাদিয়ান আসেন আর এসেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন যে, আপনি কি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন? কুরআনকে অস্বীকার করে বসেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি কীভাবে হতে পারে বা এটি কীকরে সম্ভব! আমি কুরআন মানি আর ইসলাম হল আমার ধর্ম। তখন তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মানুষকে এটিই বলে বেড়াই যে, তিনি কুরআনকে কোনভাবেই পরিত্যাগ করতে পারেন না। এরপর তিনি বলেন যে, আচ্ছা আমি যদি কুরআন শরীফ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত আকাশে যাওয়া সম্পর্কে শত-শত আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি কি তা গ্রহণ করবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শত-শত আয়াত তো পরের কথা আপনি যদি একটি আয়াতও এমন দেখাতে পারেন তাহলেই আমি মেনে নেব। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, আমি মানুষের সাথে এই বিতর্কই করে আসছি যে, হযরত মির্যা সাহেবকে মানানো কঠিন কিছু নয়। মানুষ অনর্থক হৈ চৈ করছে। এরপর তিনি বলেন যে, আচ্ছা শত-শত না থাকলেও যদি আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে একশত আয়াতই উপস্থাপন করি, আপনি কি মানবেন? তিনি (আ.) বলেন, আমি তো পূর্বেই বলেছি আপনি যদি এমন একটি আয়াতও উপস্থাপন করতে পারেন আমি মানার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। যেভাবে কুরআনের একশত আয়াত মানা আবশ্যক অনুরূপভাবে কুরআনের এক একটি শব্দও মানা আবশ্যক। এখানে একটি বা একশত আয়াতের প্রশ্ন নয়। তিনি বলেন যে, আচ্ছা একশত না হলেও যদি পঞ্চাশটি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি নিজের দাবি পরিত্যাগ করার কথা রাখবেন কি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি তো পূর্বেই বলেছি আপনি একটি আয়াত হলেও উপস্থাপন করুন আমি তা মানার জন্য প্রস্তুত আছি। এ বিষয়ে ক্রমাগতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃঢ়তা প্রকাশ পেতে দেখে তার সন্দেহ জাগে যে, কুরআন করীমে হয়ত এই বিষয়ে এত আয়াত নেই। পরিশেষে তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে আমি যদি দশটি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলেও কি আপনি মানবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে ফেলেন এবং বলেন যে, আমি তো আমার পূর্বের কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি; আপনি এ বিষয় সংক্রান্ত একটি আয়াতই উপস্থাপন করুন। তিনি বলেন, আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে আসব আর কুরআন থেকে এমন আয়াত আমি আপনাকে অবশ্যই দেখাব।

সে দিনগুলোতে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী লাহোরে অবস্থান করছিলেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ও সেখানেই ছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে বির্তকের জন্য শর্ত নির্ধারিত হচ্ছিল (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার কোন মোবাহাসা হওয়ার কথা ছিল যার শর্ত নিরুপিত হচ্ছিল) এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে পত্র বিনিময় হচ্ছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী বলতেন যে, হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। তাই কোন কথা যদি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে তা কুরআনের কথা বলেই গণ্য করতে হবে। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে হাদীসের আলোকেই বির্তক হওয়া উচিত। আর হযরত মৌলভী সাহেব [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)] বলেন যে, হাদীসের উপর কুরআন অগ্রগণ্য, তাই কুরআন থেকেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। এটি নিয়ে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলতে থাকে। বিতর্ক সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং কোনভাবে যেন বাটালভীর সাথে মোবাহাসা নির্ধারিত হয় সেজন্য হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) তার অনেক কথা মেনে নেন। আর মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, যে শর্ত আমি মানাতে চাচ্ছি তিনি তা মেনে নিচ্ছেন। সেই সময় মিয়া নিজামুদ্দীন সাহেব সেখানে পৌঁছেন এবং বলেন যে, সব বিতর্ক বন্ধ কর। আমি হযরত মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি এখন তওবা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আমি যেহেতু আপনারও বন্ধু আর হযরত মির্যা সাহেবেরও বন্ধু তাই এই মতভেদে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। আমি এটিও জানতাম যে, হযরত মির্যা সাহেবের প্রকৃতিতে পুণ্য এবং সাধুতা রয়েছে তাই আমি তার কাছে গিয়েছি এবং এই ওয়াদা নিয়ে এসেছি যে, কুরআন থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে যাওয়া সংক্রান্ত দশটি আয়াত যদি দেখিয়ে দেয়া হয় তাহলে তিনি ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাস স্থাপন করবেন। আপনি এমন দশটি আয়াত আমাকে দেখিয়ে দিন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী খুব রাগী স্বভাবের ত্বরাপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তখন তিনি বলেন, দুর্ভাগা! তুই আমার সব কাজ পণ্ড করে দিয়েছিস। আমি দুই মাস যাবৎ তর্ক করে তাকে হাদীসের দিকে নিয়ে এসেছিলাম। আর তুই আবার তাকে কুরআনের দিকে নিয়ে গেছিস। মিয়া নিজামুদ্দীন সাহেব বলেন যে, আচ্ছা দশটি আয়াতও তাহলে আপনার সমর্থনে নেই। বাটালভী বলে যে, তুই অজ্ঞ, তুই কি জানিস কুরআনের কথার অর্থ কী। তিনি বলেন, আচ্ছা তাহলে কুরআন যে দিকে আছে আমিও সে দিকে আছি। একথা বলে তিনি কাদিয়ানে আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নেন।

পবিত্র কুরআন আহমদীয়া জামা'তের সাথে আছে

তিনি [হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)] বলেন: দেখুন, কুরআনের উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কত দৃঢ় আস্থা ছিল এবং কত নিশ্চয়তার সাথে তিনি বলতেন যে, কুরআন তার বিরোধী হতে পারে না। এর অর্থ এটি নয় যে, কুরআনের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কোন বিশেষ আত্মীয়তা আছে বা জামা'তে আহমদীয়ার সাথে কুরআনের বিশেষ কোন সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন সত্যের পথ প্রদর্শন করবে আর যে পক্ষ সত্যের উপর থাকবে কুরআন

তাকেই সমর্থন করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সত্যের উপর রয়েছেন তাই কুরআনও তাঁর পক্ষেই ছিল। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, যদি আমার কোন দাবি কুরআনসম্মত না হয় তাহলে আমি সেটিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবো। এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের দাবি সম্পর্কে কোন সংশয়ে ছিলেন বরং **এটি বলার কারণ হল, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন আমার সত্যায়নই করবে। এই আশা এবং আস্থাই পৃথিবীতে তাকে সফল করেছে**। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৪১৬-৪১৮, খুতবা জুমুআ, ৮ এপ্রিল, ১৯৩২)**

অতএব, প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এই দৃঢ় আস্থা থাকা চাই যে, কুরআন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তে আহমদীয়ার সাথে আছে আর কুরআনের সমর্থনই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নেক লোকদের বক্ষ আলোকিত করে জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

বিরোধিতার ফলে উন্নতি হয়

এরপর বিরোধিতাও হিদায়াতের কারণ হয়ে থাকে, এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, **"বিরোধিতা যখন বেড়ে যায় তখন জামা'তও উন্নতি করে**। আর বিরোধিতা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন-সূচক সমর্থন এবং সাহায্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যখন কোন বন্ধু এ কথা বলতেন যে, আমাদের এলাকায় ভয়াবহ বিরোধিতা হচ্ছে তখন তিনি (আ.) বলতেন, এটি তোমাদের উন্নতির লক্ষণ। যেখানে বিরোধিতা হয় সেখানে জামা'তও বৃদ্ধি পায়। বিরোধিতার ফলশ্রুতিতে অনেক অনবহিত ব্যক্তি জামা'ত সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে জামা'তের বই-পুস্তক পড়ার আগ্রহ জাগে। আর জামা'তের বই-পুস্তক পড়ার ফলে সত্য তাদের হৃদয় জয় করে নেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একবার এক ব্যক্তি আসেন এবং তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। বয়াত গ্রহণের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনাকে কে তবলীগ করেছে? সেই ব্যক্তি অবলীলায় এই উত্তর দেয় যে, আমাকে তো মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব তবলীগ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তা কীভাবে? সেই ব্যক্তি বলেন, আমি মৌলভী সাহেবের পত্রিকা এবং তার বই-পুস্তক পড়তাম আর আমি সবসময় এটিই দেখতাম যে, তাতে জামা'তে আহমদীয়ার ভয়াবহ বিরোধিতা রয়েছে। একদিন আমার মনে হল আমার নিজেরও জামা'তের বই-পুস্তক পড়ে দেখা উচিত যে, তাতে কী লেখা আছে। আর জামা'তের বই-পুস্তক যখন পড়া আরম্ভ করলাম তখন আমার বক্ষ উন্মোচিত হয় আর আমি বয়াতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। সুতরাং বিরোধিতার প্রথম লাভ হল, এর ফলে ঐশী জামা'তের উন্নতি হয় আর অনেকেই এর মাধ্যমে সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। **(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)**

আজও বিরোধীদের বিরোধিতা মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করার কারণ হচ্ছে। অধিকাংশ মুরব্বীদের রিপোর্টেই এর উল্লেখ থাকে। অনেক পত্র সরাসরিও আমার কাছে আসে, মানুষ লিখে যে, কীভাবে বিরোধিতার ফলশ্রুতিতে তারা জামা'তের সাথে পরিচিত হয়েছে।

আহমদী হওয়ার পর এক নিরক্ষর ব্যক্তিকেও আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করেন আর সে উপস্থিত উত্তর প্রদানে সক্ষম হয় এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, "লুধিয়ানা অঞ্চলে মিয়া নূর মুহাম্মদ সাহেব নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মাঝে তবলীগের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ঝাড়ুদারদের মাঝে তবলীগ করতেন, যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ছিল। এমন শত-শত ঝাড়ুদার তার শিষ্যত্ব বরণ করে নিয়েছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনেন এবং তার কোন কোন মুরীদ অনেক সময় এখানেও এসে যেত কেননা তারা মনে করত যে, হযরত মির্যা সাহেব আমাদের পীরেরও পীর। এখানে সম্পর্কে আমাদের এক চাচা, নিছক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা এবং তাঁর দাবিকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করার জন্য নিজেকে মেথরদের পীর হিসাবে পরিচিত করে রেখেছিল। (তিনি আর কিছু তো করতে পারেন নি, তবে রটিয়ে রেখে ছিলেন যে, তিনি মেথরদের পীর) আর তার দাবি ছিল, আমি লাল বেগ (অর্থাৎ মেথরদের নেতা)। একবার এমন কিছু মানুষ যারা ঝাড়ুদারদের ভিতর থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল এখানে আসে। তাদের হুক্কা পান করার অভ্যাস ছিল। (যে ব্যক্তি মেথরদের নেতা হওয়ার দাবি করত বা পীর হওয়ার দাবি করত, বংশগতভাবে সে মোঘল ছিল।) তারা যখন তার বৈঠকে হুক্কা দেখে তখন হুক্কার খাতিরে তারা সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমাদের এই চাচা তাদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন আর বলেন যে, তোমরা মির্যা সাহেবের কাছে কেন এসেছ? তোমরা তো সত্যিকার অর্থে আমার মুরীদ বা শিষ্য। মির্যা সাহেব তোমাদের কী দিয়েছেন? সাধারণত মেথর যেমন হয়ে থাকে তারাও নিরক্ষর ছিল।" (এটি আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বেকার কথা যখন তিনি এটি বর্ণনা করছেন) তিনি (রা.) বলেন, "আজকাল মেথররাও কিছুটা সচেতন হয়ে গেছে, কিন্তু এটি আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের কথা] তখন এই জাতি একেবারেই অজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদের এই চাচা যখন তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, মির্যা সাহেব তোমাদের কী দিয়েছেন? তারা উত্তরে বলে, আমরা বেশি কিছু জানি না। কিন্তু এতটা আমরা অবশ্যই বুঝি যে, মানুষ পূর্বে আমাদেরকে চূড়া বা মেথর বলত, কিন্তু মির্যা সাহেবের সাথে সম্পর্কের কারণে এখন আমাদেরকে মির্যায়ী বলে। অর্থাৎ আমরা মেথর ছিলাম, তাঁর কল্যাণে এখন আমরা মির্যায়ী হয়ে গেছি। কিন্তু আপনি পূর্বে মির্যা ছিলেন আর মির্যা সাহেবের বিরোধিতার কারণে এখন মেথর হয়ে গেছেন।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এ কথাগুলো বাহ্যত চুটকি বা কৌতুক হলেও এর মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের গভীর দর্শনও রয়েছে। এই নিরক্ষররা নিজেদের ভাষায় একথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা নবীর বিরোধীদের ধ্বংস করেন আর মান্যকারীদের উন্নতি দান করেন। অতএব সত্য কথা হল, আহমদী হওয়ার পর পরই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ধর্মীয় বিষয়ে প্রখর হয়ে যায় এবং আলেমদের উপরও তারা বিজয়ী হয়। এই বিষয়টিকে বাদ দিলেও এমন আহমদী কে আছে যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তার শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে নেই, বরং প্রত্যেক আহমদী নিজ

বোধ-বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজ শ্রেণীর সকল খ্রিষ্টান, হিন্দু, শিখ এবং অ-আহমদীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হবে। (অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়াদিতে)। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৬তম খণ্ড, পৃ: ৭৯৭-৭৯৮, খুতবা জুমুআ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫)**

আহমদীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভিনব দৃষ্টান্ত

আহমদীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভিনব দৃষ্টান্ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামকে বাস্তবায়নের বাসনা ও আহমদীয়াতের কারণে বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া আর আহমদীয়াতের খাতিরেই শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হওয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমার শৈশবে গুজরাতের লোকদের এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) আসার কথা মনে আছে। তখন শিয়ালকোট এবং গুজরাতকে জামা'তের কেন্দ্র মনে করা হতো। গুরুদাসপুর তখন অনেক পিছিয়ে ছিল, কেননা রীতি হল স্বদেশে নবীকে কখনো মূল্যায়ন করা হয় না। সেই যুগে শিয়ালকোট ছিল প্রথম স্থানে আর গুজরাত ছিল দ্বিতীয় স্থানে। গুজরাতের অনেকের চেহারা আমার এখনো মনে আছে। আমার মনে পড়ে, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম **'ইয়া'তীকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক'**-এর পরিপূর্ণতাস্বরূপ আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে অনেকেই পায়ে হেঁটে কাদিয়ান আসতেন। (আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নয় বরং ইলহামের পরিপূর্ণতার বাসনা নিয়ে তারা শিয়ালকোট এবং গুজরাত থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান আসতেন)। তাদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নৈকট্যপ্রাপ্ত অনেক বড় বড় নিষ্ঠাবান সাহাবীও ছিলেন। এটিও গুজরাত জেলার লোকদের ঘটনা যা মরহুম হাফেয রৌশন আলী সাহেব শোনাতেন। আর আমিও এটি উল্লেখ করেছি। ঘটনাটি হল, জলসা সালানার সময় একটি দল একদিক থেকে আর দ্বিতীয় দল ভিন্ন দিক থেকে (পায়ে হেঁটে বা পদব্রজে) আসছিলেন।

হাফেয সাহেব বলেন, আমি দেখেছি উভয় দল (যার একটি একদিক থেকে আসছিল এবং অন্যটি ভিন্ন দিক থেকে) যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন তারা ডুক্‌রে কেঁদে উঠে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কাঁদছ কেন? তারা বলে, আমাদের এক অংশ প্রথমে ঈমান এনেছে (অর্থাৎ আগমনকারী দু'টো জামা'তের মধ্যে একটি তাদের, যারা প্রথমে ঈমান এনেছে) আর সেই কারণে তাদেরকে দ্বিতীয় দলের পক্ষ থেকে এত দুঃখ এবং কষ্ট দেয়া হয়েছে (একই এলাকার অধিবাসী ছিলেন) এবং এত নির্যাতন করা হয়েছে যে, এক পর্যায়ে তারা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এরপর আমরা জানতাম না যে, তারা কোথায় গিয়েছে? কিছুকাল পরে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতের জ্যোতি আমাদের মাঝেও বিস্তৃত করেন। আর আমরা যারা বিরোধিতা করে আহমদীদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করেছি (অর্থাৎ এরা বিরোধী ছিল) তারা নিজেরাই আহমদী হয়ে যাই। (অর্থাৎ যারা বিরোধী ছিল তারাও পরবর্তীতে, প্রথম বয়াতকারীদের বহিষ্কারের পর, আহমদীয়াত গ্রহণ করে)। তারা বলেন, "এখন এখানে আসার পর ঘটনাচক্রে ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে আমাদের সেসব ভাই, যাদেরকে আমরা তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলাম, অন্যদিক থেকে সামনে এসে গেছে। তাদেরকে দেখে আমাদের হৃদয় এই ব্যাথায়

ভরে গেছে যে, এরা আমাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকতো কিন্তু আমরা তাদের সাথে শত্রুতা করতাম, বিরোধিতা করতাম, এমনকি আমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছি। আজ খোদা তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে এখানে সমবেত করে দিয়েছেন।"
(আল্লাহ্ তা'লা কে রাস্তে মে তাকালীফ, আনোয়ারুল উলুম, ১৩তম খণ্ড, পৃ: ৮৬-৮৭)

অতএব, এ কারণে আবেগে আপ্লুত হয়ে আমরা কাঁদছি। সুতরাং আহমদীয়াতের কল্যাণই বিচ্ছিন্ন লোকদের সমবেত করে। শয়তান যাদের মাঝে বিরোধ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াত অবশেষে তাদেরকে মিলিত করে। ইনশাআল্লাহ্ এখনো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন দৃশ্য সামনে আসবে।

মৌলভীরা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এই যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ঈসা (আ.) নিজ হাতে পাখি বানাতেন, এরপর সেগুলোতে প্রাণ ফুৎকার করতেন আর সেই পাখি সাধারণ পাখির মত উড়তে আরম্ভ করতো; এটি কুরআন না বুঝার কারণে হয়েছে। এর অর্থ হল, আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকভাবে খোদার দিকে উড়ে যাওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন। যাহোক এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মৌলভী একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আলোচনা করছিল বা কথা বলছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার এক মৌলভীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা তো বলেন ঈসা (আ.) পাখি বানাতেন, তার অর্থ হল আজকে পৃথিবীতে আমরা যত পাখি দেখতে পাই সেগুলোর কতক আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক সৃষ্ট আর কতক ঈসা (আ.) কর্তৃক। এখন এই উভয় প্রকার পাখির মাঝে আপনি কি কোন পার্থক্য দেখাতে পারেন যার মাধ্যমে এটি বুঝা যাবে যে, কোনটি মসীহ্র সৃষ্ট আর কোনটি আল্লাহ্র সৃষ্ট? তখন সেই মৌলভী বলে যে, এটি তো কঠিন ব্যাপার, কেননা আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং ঈসা (আ.)-এর সৃষ্ট পাখি এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন উভয় প্রকার পাখির মাঝে পার্থক্য করা কঠিন।"
(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯৬)

খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহারের আপত্তি

এরপর এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয় যে, **তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন, অথচ যদি যাচাই করা হয় তাহলে (দেখা যাবে—) বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন**। তিনি কখনো প্রথমে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি। যাহোক, এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "অনেক সময় কথা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সেসব কথার কিছুটা উত্তরও দিতে হয়। খ্রিষ্টানরা সবসময় মহানবী (সা.)-এর উপর আক্রমণ করতো আর মুসলমানরা যেহেতু তাদের আক্রমণের উত্তর দিত না তাই খ্রিষ্টানরা ভাবতো ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার ভেতর অনেক দোষ-ত্রুটি রয়েছে। যদি কারো মাঝে ত্রুটি না থাকে তাহলে একমাত্র ঈসা (আ.)-এর সত্তাতেই কোন ত্রুটি নেই। তারা মুসলমানদের শালীনতাকে দুর্বলতা মনে করতো। তারা মনে করতো আমরা যেহেতু নোংরামি করি, অপলাপ করি আর তারা করে না, এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের নেতার মাঝে এই দোষ রয়েছে।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আর বছরের পর

বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে। সাত-আট শত বছর পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা অব্যাহতভাবে মুসলমানদের উপর বা মহানবী (সা.)-এর উপর কাঁদা ছুড়তে থাকে, নোংরামির বেসাতি করতে থাকে আর মুসলমানরা তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই অনুমতি দেন যে, এখন তুমিও ক্ষমতা প্রদর্শন কর, আর তাদেরকে বল যে, তোমাদের কোন দোষ বা ত্রুটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে কী-না? অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন হযরত ঈসা (আ.)-কে সম্বোধন করে সেসব কথা লেখা আরম্ভ করেন যা ইহুদীরা তার সম্পর্কে বলত বা স্বয়ং খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন বই-পুস্তকে যা লেখা আছে। এতদসংক্রান্ত মাত্র দু'চারটি বই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছিলেন আর পুরো খ্রিষ্ট জগতে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় যে, এ রীতি সঠিক নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমরা তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের রীতি সঠিক নয় কিন্তু তোমরা আমাদের কথা বুঝতে না। অবশেষে তোমাদের উপর যখন আঘাত আসা আরম্ভ হয়, তখন তোমরা সম্বিত ফিরে পেয়েছ আর এখন বলছ যে, এ রীতি সঠিক নয়। **(আল-ফযল কাদিয়ান, ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮, পৃ: ৬-৭, ২৬তম খণ্ড, সংখ্যা-২৮৩)**

তাই অনেক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন তা প্রত্যুত্তরে করেছেন, প্রথমেই তিনি এমনটি আরম্ভ করেন নি। পাঞ্জাবের একজন বড় খ্যাতনামা চিকিৎসক, খলীফা আউয়াল (রা.)-ও যার প্রশংসা করতেন, সেই চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই চিকিৎসক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। কিন্তু এই ভালোবাসা সত্ত্বেও তার দাবির সত্যায়ন করতেন না। তার একটি মজার ঘটনা রয়েছে। হাকীম সাহেবের মতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত ঘোষণার পেছনে কারণ এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। যদিও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে আরম্ভ করেন যে, হযরত শোয়েব (আ.) যখন মানুষকে বলতেন যে, তোমরা অন্যদের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না। নিজেদের সম্পদকে অন্যায় কাজে ব্যয় করো না তখন তার কথা শুনে তার জাতি আশ্চর্য হতো এবং বলতো যে, শোয়েব পাগল হয়ে গেছে এবং উন্মাদের মত কথা বলছে। [তিনি (রা.) বলেন] এ যুগেও আমরা দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানুষ (নাঊযুবিল্লাহ্) উন্মাদ বা পাগল বলে আখ্যায়িত করে। তিনি (আ.) যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয় পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেন, মুসলমানরা তখন বুঝতেই পারে নি যে, তেরশত বছর ধরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জ্যেষ্ঠরা যখন এ বিশ্বাস [ঈসা (আ.) আকাশে আছেন] উপস্থাপন করে আসছে তাই তার মৃত্যু কীভাবে হতে পারে! এই বিষয় সম্বন্ধে মানুষের এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (রা.) হাকীম সাহেবের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই ঘটনা (অর্থাৎ হাকীম সাহেবের ঘটনা) থেকেই বুঝা যায় যে, তাদের এই বিশ্বাস কতটা বদ্ধমূল ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন- এটি কখনও হতেই পারে না।

তিনি (রা.) বলেন, "পাঞ্জাবের এক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন যার দক্ষতা হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর মত চিকিৎসকও স্বীকার করতেন, তার নাম ছিল হাকীম আলাদ্দীন এবং তিনি ভেরা নিবাসী ছিলেন। একবার তার কাছে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর একজন আন্তরিক

বন্ধু এবং অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ আহমদী ভেরার মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব যান এবং তাকে (অর্থাৎ হাকীম সাহেবকে) কিছুটা তবলীগ করেন। কথা শুনে হাকীম সাহেব বলেন, মিয়া! তুমি আমাকে কী তবলীগ করছ? তুমি কীইবা জান আর আমাকে কীইবা বোঝাবে? মির্যা সাহেবের জন্য আমার হৃদয়ে যেই শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আছে তার দশ ভাগের এক ভাগ, এমনকি বিশ ভাগের এক ভাগ বিশ্বাস বা ভালোবাসাও তোমার হৃদয়ে নেই। মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব এ কথা শুনে আনন্দিত হন আর ভাবেন যে, এ ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আহমদী। তিনি বলেন, এ কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত যে, আপনি মির্যা সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং ভালোবাসা রাখেন। আমি জামা'ত সম্পর্কে আপনার আরো মতামত শুনতে পেলে আনন্দিত হব। তিনি বলেন যে, আজকালকার অজ্ঞ যুবক শ্রেণী কথার গভীরে অবগাহন করে না আর এভাবেই তবলীগের জন্য বেরিয়ে পড়ে। এখন তুমি এসেছ আমাকে ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সম্পর্কে বোঝানোর জন্য, অথচ তুমি কীইবা জানো যে, এই বিষয়টি উপস্থাপনের পেছনে মির্যা সাহেবের উদ্দেশ্য কী! তিনি উত্তরে বলেন, আপনি নিজেই আমাকে বলুন। তিনি বলেন, শুন, আসল কথা হল মির্যা সাহেব বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ লিখেছেন। তেরশত বছরে কোন মুসলমানের সন্তান এমন ছিল কী, যে এমন পুস্তক লিখবে? মির্যা সাহেব এতে এমন জ্ঞানভান্ডার উপস্থাপন করেছেন যে, কোন মুসলমানের কোন গ্রন্থ এর সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই গ্রন্থ ইসলামের স্বপক্ষে এক অনতিক্রম্য প্রাচীর ছিল যা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু মৌলভীরা এমন নির্বোধ এবং আহাম্মক যে, তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর শ্রদ্ধাভরে নতজানু হয়ে তাকে এ কথা বলা যে, ভবিষ্যতে আমরা আপনার দেয়া দলীল প্রমাণই ব্যবহার করব— এর পরিবর্তে উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দিয়ে বসে। আর ইসলামের এমন অসাধারণ সেবা বা খিদমত দেখা সত্ত্বেও যা মুহাম্মদ (সা.) এর পর তের শত বছরে আর কেউ করে নি, তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া প্রদান আরম্ভ করে এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন আরম্ভ করে, আর মনে করে যে, আমরা অনেক বড় ব্যক্তিত্ব। হাকীম সাহেব বলেন, এতে মির্যা সাহেবের রাগান্বিত হওয়া উচিত ছিল এবং তাঁর রাগ হয়েছে। (এ পর্যায়ে হাকীম সাহেব নিজের যুক্তি উপস্থাপন করছেন) তাই মির্যা সাহেব মৌলভীদেরকে বলেন যে, আচ্ছা তোমরা বড় আলেম সাজো। যদি নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে এতটাই অহংকারী হয়ে থাক তাহলে দেখ যে, কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা এতটা বা এভাবে প্রমাণিত যে, এর বিরুদ্ধে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু আমি কুরআন থেকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। যদি তোমাদের শক্তি থাকে তাহলে এর খণ্ডন উপস্থাপন কর। তাই তিনি মৌলভীদের বোকামি এবং নির্বুদ্ধিতাকে স্পষ্ট করার জন্য ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তাদের সামনে উপস্থাপন করেন এবং কুরআন থেকে এর প্রমাণ দেয়া আরম্ভ করেন। হাকীম সাহেব বলেন, মৌলভীরা এখন পুরো শক্তি প্রয়োগ করলেও এবং তাদের জিহ্বা যদি ক্ষয়ও হয়ে যায় আর কলম ভেঙ্গেও যায় তাহলেও সমগ্র ভারতের মৌলভীরা সম্মিলিতভাবেও মির্যা সাহেবের প্রমাণের মোকাবিলা করতে পারবে না। মির্যা সাহেব তাদেরকে এমনভাবে ধৃত করেছেন যে, তাদের মাঝে মাথা উঠানোরও শক্তি নেই।

(হাকীম সাহেব বলেন,) এখন এর চিকিৎসা একটিই। [এমনিতে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কোন প্রমাণ নেই, ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকাই নিজ স্থানে সঠিক, এখন মৌলভীদেরকে সোজা করার বা এই বিতন্ডা ও সমস্যা সমাধানের একটাই উপায়) আর তা হল, সব মৌলভীর সম্মিলিতভাবে একটি প্রতিনিধি দলের আকারে মির্যা সাহেবের কাছে যাওয়া উচিত এবং তাঁকে বলা উচিত যে, আপনার বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া প্রদান করা আমাদের পক্ষ থেকে চরম বেয়াদবী হয়েছে। আমাদের ক্ষমা করা হোক। এরপর মির্যা সাহেব যদি কুরআন থেকে ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা প্রমাণ করে না দেখান তাহলে আমাকে বলবেন। **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০৭-১০৮)**

তিনি এখানে নিজের পক্ষ থেকে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এখন দেখুন, শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস এমনভাবে তার মাঝে বদ্ধমূল ছিল যে, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করতে পারেন নি অথচ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। অতএব কেবল আল্লাহ্ তালার কৃপা হলেই কেউ যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আমাদের সবসময় এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি কোন আইডিওলজিক্যাল বা দৃষ্টিভঙ্গিগত বিশ্বাস নয়, বরং তৌহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পৃথিবীতে এসে খোদার একত্ববাদই প্রতিষ্ঠিত করার ছিল। অতএব এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি প্রমাণ করে খাঁটি তৌহীদের পথে যে বাঁধা ছিল তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দূরীভূত করেছেন। এ কারণেই তিনি এই বিষয়ের উপর গভীর গুরুত্বারোপ করতেন। দিবারাত্র এ কথাই বলতেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন] আমার মনে আছে একবার কেউ বলে যে, হুযুর! এই বিষয়টিকে এখন বাদ দিন। এতে তিনি (আ.) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বলেন, অনেক সময় এ সম্পর্কে আমার মন-মস্তিস্কে এত উদ্দীপনা জাগে যে, আমি ভাবি কোথাও আমি পাগল না হয়ে যাই। এই বিষয়টি ইসলামের ভয়াবহ ক্ষতি করেছে, আর আমরা যতক্ষণ এটিকে পিষ্ট না করব ততক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি না। অনেকে অনেক সময় বলে যে, এটি তো তেমন কোন বিষয় নয়, কিন্তু আসল কথা হল এটি একত্ববাদের পথে এক বাঁধা যা দূরীভূত করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে এত গভীর উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা ছিল। আর এটিই সেই আবেগ ও উচ্ছ্বাস যা খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকৃষ্ট করেছে এবং সত্যের ভিত রচনা করেছে। আর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি, যে ইসলামকে ভালোবাসে সে বুঝতে পারে যে, এটি সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। যদি কেউ অনুভব করে যে, তার হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা এবং ইসলামের তবলীগের একাগ্রতা রয়েছে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এটি সেই অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল। সুতরাং আমাদের সমূহ প্রচেষ্টা এই কথাকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত এবং এরই মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু আমরা যদি এ কথাকে না বুঝি তাহলে আমরা যে কাজই করি না কেন তা বাহ্যত তৌহীদ বা একত্ববাদ মনে হলেও সেটি আসলে কোন শির্কের পূর্ব লক্ষণ হবে। **(আল-ফযল কাদিয়ান, ১৮ মে ১৯৪৩, পৃ: ৩, ৩১তম খণ্ড, সংখ্যা-১১৭)**

(একই বিষয়) তৌহীদও আবার শির্‌কেরও পূর্বলক্ষণ, এটি কীভাবে হতে পারে? এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক ব্যক্তি এখানে পড়ালেখা করতেন। তিনি প্রতিদিনই এই বিতর্ক করতেন যে, মহানবী (সা.) আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মাথায় রূমী টুপি ছিল। একদিন এক ব্যক্তি তাকে ডেকে বলে, তুমি কি মনে কর যে, রসূলে করীম (সা.) এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তখন সেই ব্যক্তি নির্লজ্জের মত বলে বসে, হ্যাঁ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এখন এটি জেনে গেছেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন] এর কারণ হল, মানুষ 'ওয়াহ্‌দানীয়াত' বা এক-এর সাথে সম্পর্ক পর্যন্ত যায় কিন্তু 'আহাদীয়াত' বা এককত্ব পর্যন্ত পৌঁছে না। (এখানে বুঝার জন্য দু'টি বিষয় রয়েছে, 'ওয়াহ্‌দানীয়াত' এবং 'আহাদীয়াত'। অর্থাৎ তারা 'ওয়াহ্‌দানীয়াত' পর্যন্ত তো যায় কিন্তু 'আহাদীয়াত' পর্যন্ত পৌঁছায় না) যেখানে পৌঁছানোর পর জানা যায় যে, যদিও মানুষও এক ধরনের স্রষ্টা, রিয্‌কদাতা কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা ভিন্ন আর সৃষ্টি অন্য। সত্তার ক্ষেত্রে উভয়ে কখনো সমান নয়।" আর হতেও পারে না। **(আল্ ফযল কাদিয়ান, ১৮ মে ১৯৪৩, পৃ: ৩, ৩১তম খণ্ড, সংখ্যা-১১৭)**

'ওয়াহেদ' এবং 'আহাদ'-এর অর্থ, অভিধান এর দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরছি যেন বুঝা সহজ হয়। **আল্লাহ্ তা'লা ওয়াহেদও এবং আহাদও**। ওয়াহ্‌দানীয়াত এর অর্থ হল, বৈশিষ্ট্যে একক ও অনন্য। আর আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও মানুষের সত্তায় প্রতিফলিত হয়। আর এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত বা সর্বোত্তম প্রতিফলন, যা কোন মানুষের মাঝে হওয়া সম্ভব ছিল, তা হয়েছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়। কিন্তু গুণাবলীর ক্ষেত্রে কামেল বা পরমোৎকর্ষ সত্তা একমাত্র খোদা তা'লারই। আহাদের অর্থ হল খোদার এক হওয়া বা নিরঙ্কুশ অর্থে এক হওয়া এবং আহাদের বিপরীতে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বের কথা ধারণাই করা যেতে পারে না। অতএব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বলেছেন যে, প্রকৃত তৌহীদ তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমরা আহাদীয়াতের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম বুঝব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় প্রকৃত তৌহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ ভূমিকা রাখতে পারি।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ এপ্রিল ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ১৪, পৃ. ৫-৮)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।